আফগানিস্থানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

বিঃদ্রঃ এখানে শুধু বইটিতে উল্লেখিত অলৌকিক ঘটনা গুলো আনা হয়েছে। এই পিডিএফ বইটির টেক্সট সংগ্রহ করা হয়েছে নিচে দেওয়া সাইট থেকে। মূল বইটিও এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন

https://justpaste.it/9cfim

আজ মুসলিম উম্মাহের বিজয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা পরাজিত মন মানসিকতা। আথচ আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

আমাদের রব ময়দানের মুজাহিদদের প্রতিনিয়ত এমন সব অলৌকিক বিজয় দান করছেন যা কুফ্ফারদের হৃদয়ে কাপন ধরাচ্ছে আর, মুমিন হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়ন করছে।

ময়দানে মুজাহিদ ও শহীদদের সাথে ঘটে যাওয়া ইমান জিন্দাকারী এই অলৌকিক ঘটনাগুলো মুমিন হৃদয়ে ইমানের জোশ সৃষ্টি করবে, পরাজিত মানসিকতা দূর করবে।

অনুরোধ: ঘটনাগুলো পড়ুন বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিন।

ঘটনা শুরু

(০১) গুলি করার পরও অক্ষত রইল ছাত্ররা!

গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন হেফযখানায় কয়েকটি মাসুম বাচ্চা দুলে দুলে কুরআন মুখস্থ করছিলো। হৃদয়ের সুরক্ষিত ফলকে উৎকীর্ণ করছিলো কালামে-ইলাহীর একেকটি আয়াত।

হঠাৎ করে এই গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালালো সোভিয়েত দখলদার, নাস্তিক, হায় ওয়ান, লাল-সেনারা।

কা,ফে-র কমিউনিস্টদের একজন অফিসার গোছের লোক হেফখানার বে-গুনাহ্ বাচ্চাদের হাত থেকে কুরআন শরীফ কেড়ে নিতে চাইলে নিস্পাপ শিশুরা তাদের কুরআন শরীফ গিলাফে ভরে গলায় ঝুলিয়ে নেয়।

আফগান মুসলমানের সা,হসী সন্তানেরা এসব পশুর হাতে আল্লাহর পবিত্র কিতাব দিতে রাজী হয়নি।

ইতিমধ্যে কয়েকজন রুশ অফিসার বাচ্চাদের ব্যবহারে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং এ শিশুদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলির নির্দেশ দেয়।

ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত পাংশু চেহারার শিশুরা আল্লাহ..ও আল্লাহ...আল্লাহ...গো বলে আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের চারপাশের বাড়ী-ঘর আগুনে জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মরণ চিৎকার।

করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছে মা-বোন ও মেয়েরা।

হাফেয শিশুদের উপর ফায়ার করা হলে এরা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গ্রামটিতে কিয়ামত ঘটিয়ে যখন সোভিয়েত কুকুরগুলো চলে গেছে, তখন বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরা মসজিদের সামনে গিয়ে দেখতে পেলো, সবগুলো হাফেয শিশু শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

পরিচিত মানুষদের দেখে তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো। গ্রামবাসী

তো অবাক, একটি শিশুও মরেনি বা আহত হয়নি। গুলি এদের বুকে বিদ্ধ হয়নি। দেখা গেলো, এদের | বুকে ঝুলানো কুরআন শরীফের গিলাফের ভেতর কিছু বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে।

সোনার টুকরো শিশুদের জীবিত পেয়ে তাদের বাবা-মা গাফুরুর রহীমের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

(০২) নড়ে উঠলো শহীদের লাশ!

বুড়ো বাবা-মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জিহাদে শরীক হয়েছিল সোভিয়েত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে।

এই তরুণটি শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে খবর দিলেন।

আসতে যেতে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বুড়ো থুথুড়ে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বৃদ্ধের দাবী হলো, তিনি তাঁর ছেলেকে দেখবেন। এছাড়া ছেলেটি তার শাহাদাতের মর্যাদা পেলে কিনা তা জানবেন।

জয়ীফ বুড়োর আহাজারি আর করুণ আকুতির প্রেক্ষিতে

কমান্ডার মাওলানা হাক্কানী শহীদের কবর খোড়ার অনুমতি দিলেন।

দাফনের পাঁচ দিন পর যখন কবর খোলা হলো, জান্নাতী সুবাসের এক স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় তখন আশেপাশের মুজাহিদরা বিমোহিত হয়ে পড়লেন।

প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই বুড়ো তার নয়নমণির লাশ দেখে পাগলপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠলো; বাবা, তুই কি শহীদী মওত পেয়েছিস?

আমি আর তোর মা কি এখন শহীদের বাবা-মা?

নড়ে উঠলো শহীদের লাশ, মুখে উচ্চারিত হলো সালামঃ হা! বাবা আপনাদের ছেলে একজন শহীদ। কথাটি বলেই একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুসাফাহা করলেন শহীদ তাঁর দুঃখী পিতার সাথে।

দীর্ঘ পনেরো মিনিট এভাবেই করমর্দনরত ছিলেন শহীদ পুত্র আর তাঁর পিতা। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বহুসংখ্যক মুজাহিদ।

শহীদ পুত্রের কবর পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে শান্ত মর্নে ফিরে গেলেন বুড়ো।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর তৃপ্তির প্রবাহ।

হৃদয় জুড়ে স্বর্গীয়-প্রশান্তির কোমল পরশ।

(০৩) এক মুঠো বালির আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো সবগুলো ট্যাঙ্ক!

অন্ধকার রাতে পথ ভুলে একজন হাফেযে কুরআন তরুণ মুজাহিদ সোভিয়েত সৈন্যদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠলো।

লম্বা জামা গায়ে, মাথায় টুপী-একজন লোককে দেখেই ক্যাম্পের সেন্ট্রিরা তাকে ধরে নিয়ে গেলো এক কর্নেলের তাঁবুতে।

মুজাহিদদের গুপ্তচর ভেবে হাফেয ছেলেটিকে তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু পথহারা এই তরুণের কাছে তারা উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য না পেয়ে তার উপর নির্যাতন শুরু করলো।

এক পর্যায়ে ক্যাম্পটির ইন-চার্জ রুশ কর্নেল এসে | বললো, এই ছোকরা, শোন্! তোরা নাকি বালি বা কংকরে ফু দিয়ে নিক্ষেপ করলে তা বিস্ফোরিত হয়ে কমিউনিস্ট সৈন্যদের ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, কামান ইত্যাদি পুড়ে যায়?

যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তোক ছেড়ে দেয়া হবে, আর না পারলে মৃত্যু।

হাফেয ছেলেটি বহুবার এমন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, তবে কোনদিনই সে নিজে এমন করেনি।

সীমাহীন শংকা ও দ্বিধা নিয়ে সে বললো, আমাকে একটু ওযুর পানি দিন।

নামাযে দাঁড়িয়ে হাফেয ছেলেটি কেঁদে-কেটে কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোআ করলো

আয় আল্লাহ! তোমার দুশমনেরা কুরআনের শক্তি দেখতে চায়। দেখতে চায় ইসলামের সত্যতা । তোমার পথের সৈনিকদের কারামত নাস্তিকরা মানে না। তোমার কুদরত, কুরআনের শক্তি এবং ইসলামের সত্যতা তুমি প্রমাণ কর। আল্লাহ্ আমার প্রাণ নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই। তোমার দ্বীনের হুরমত, ইসলামের সৈনিকদের ইজ্জত নিয়ে আমি চিন্তা করছি। আয় খোদা! তুমি তোমার কুদরত দেখাও ইসলামকে-জিহাদকে-আফগান জাতিকে, আমার বুকে লুকানো ত্রিশ পারা কালামকে তুমি শরমিন্দা করো না।

সিজদা থেকে মাথা তুললো হাফেয তরুণটি, চোখে তার অশ্রুর বন্যা, মুখে একটি প্রভাময় বিশ্বাসের জান্নাতী দীপ্তি, ঠোটে উচ্চারিত হলো: “ওমা রামাইতা....ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা।”

বড় বড় রুশ সামরিক অফিসার, শত শত কমিউনিস্ট আর্মি উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে এই মর্দে ফকিরের দিকে-সামনের খোলা মাঠে আঠারটি ট্যাংক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো।

হাতে একমুঠো বালি নিয়ে আল্লাহর নামে ছুঁড়ে মারলো অসহায় হাফেয ছেলেটি-বিস্ফোরিত হলো প্রতিটি বালিকণা। চুরমার হয়ে গেল সবগুলো ট্যাংক, দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো রুশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প-ভয়াল শব্দে | কেঁপে উঠলো পাহাড়ী উপত্যকার পাথুরে মাটি।

পরিস্থিতি দেখে দুই হাত তুলে

আত্মসমর্পণ করল কর্নেলসহ সমস্ত ব্যাটেলিয়ন।

নাস্তিক সৈন্যরা আল্লাহর জাজ্বল্য সাহায্য ও শক্তি দেখে সোভিয়েতপক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিল আল্লাহওয়ালা মুজাহিদদের দলে

এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সাথে নিয়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে ফিরে এল পথ হারা এই বন্দি হাফেজ।

(০৪) ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়

"নাহিদ" রাজধানী কাবুলের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা ফরিদ খান ছিলেন কাবুলে কমিউনিস্ট পার্টির একজন উঁচু দরের পান্ডা।

ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় নাহিদ হয়ে উঠেছিল স্বভাবতই একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেয়ে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তার সুনাম সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিলো।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশ জনের চেয়ে বেশি। পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও ধর্ম সচেতনতা ছোটবেলা থেকেই শিকড় গেড়ে বসে।

মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের শাসনক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় আহত হয়।

কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তাঁর মনোভাব চেপে যেতে থাকেন। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়ীতে বসেই তিনি অনেক আগাম সংবাদ ও গোপন পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেতেন।

অতএব,

আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সাথে নাহিদ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক গোপন তথ্য মুজাহিদদের আগাম জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আযাদীর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি তার স্কুলে সহপাঠিনীদের মাঝেও জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন।

নাহিদের মতো সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টারই সুফল হিসেবে গোটা আফগান জিহাদে মুসলিম নারী সমাজের সক্রিয়

অংশগ্রহণ সম্ভব হয়।

কাবুলের রাবেয়া বলখী ও সুরিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা যেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে। গগনবিদারী শ্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিলো, সেদিনই দুশমনরা বুঝে গিয়েছিল যে, গোটা আফগানিস্তান এবার রাজপথে নামবে।

এ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশ দখলদার বাহিনী ও কারমাল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিজেদের কালো ওড়না উড়িয়ে রাজপথে বের হয়ে এসেছিলো।

রুশ বাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে গুলিতে বেশ কিছু ছাত্রী হতাহত হয়।

সে মিছিলের পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে তার দুটো হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তার সহপাঠিনীর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিলঃ “এটা শক্ত করে ধর বোন। এ তো ইসলামের পতাকা, স্বদেশের আযাদীর পবিত্র ঝাণ্ডা এটা। একে কিছুতেই নিচে নামানো যায় না।”

আযাদী ও সম্মানের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রীরা ছিল নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী।

নাহিদদের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াতে আসতো সোভিয়েত সেনা

অফিসারেরা।

তাঁর বাবার সাথে উঁচু পর্যায়ের লোকদের ওঠাবসা-সখ্যতা।

একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদদের বাড়ী এসে নাহিদকে এক নজর দেখে ফেলে। সাথে সাথে সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়।

নাহিদের বাবা ফরিদ খানকে সে লোকটি বলেঃ তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। সেনা অফিসারটি মনে মনে ভাবতে থাকে, এতো খুবসুরত কন্যা ঘরে রেখে ফরিদ খান আমাদের সাথে বেঈমানী করছে।

তার তো আরও আগেই এ মেয়েটিকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুক্তচিন্তা ও উদার মনের অধিকারী,

প্রগতিশীল কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। এছাড়া রুশ বাহিনীর সামনে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করার মতো দুঃসাহস তো কাবুলের সরকার প্রধানেরও নেই।

কিন্তু ফরিদ খান খুব ভালো করেই জানেন যে, তার মেয়ে নাহিদকে কোনক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না।

অতএব, খুবই নরম স্বরে ফরিদ খান বলে চললেনঃ নাহিদ খুব লাজুক মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজী হবে না।

রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেনঃ তুমি না কমিউনিস্ট!

ফরিদ খান দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট।

রুশ কর্মকর্তা অত্যন্ত রাগতস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেনঃ না, তুমি কমিউনিস্ট হতে পারোনি। কোন কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না।

কোন কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে।

যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি আর সমৃদ্ধি চাও, তবে পাক্কা কমিউনিস্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রী, কন্যাদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দাও। এ ব্যাপারেই তো আমরা এতোদূর থেকে তোমাদের সহায়তায় ছুটে এসেছি।

রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুবই লজ্জিত হলেন। রুশ সেনা অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

নিজেকে পাকা কমিউনিস্ট প্রমাণিত করার আকাক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও ফরিদ খানের মনে।

মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে

রুশ সৈন্যদের সাথে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তার বাবার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্কের সকল সুফল।

এসব শুনে নাহিদ ভেতরে ভেতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। সে অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সাথেই আমি এখনো বসবাস করছি।

আমি ভাবতেও পারি না যে, কোন জন্মদাতা পিতা এতো আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে।

আপনি তো শুধু ইসলামই ত্যাগ করেননি; বরং আমাদের দেশীয় এবং সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

ফরিদ খান তার কিশোরী কন্যাকে স্নেহমাখা গলায় বুঝাতে শুরু করেনঃ “শোন | মা নাহিদ, তুমি বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। অনেক পুরনো কিছু নীতিকথা।

একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশে এসব বিধি-নিষেধের জাল পেতেছে। দেড় হাজার বছর আগে একসময় ইসলাম হয়তো আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিলো, কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও

প্রগতির যুগে সেটিই আঁকড়ে রাখতে হবে কেন?

কী করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা আদর্শ এ সময়েও অনুসরণ করে চলা। নাহিদ, তুমি কি কোনদিন চিন্তা করে দেখেছ? লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীসমাজের উপর কী পরিমাণ নির্যাতন চলছে।

এসব মোল্লা-মওলবীরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট, সেই আমেরিকার অবস্থাই চিন্তা কর। ওখানে তো নারীরা স্বাধীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। কল-কারখানায় পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সভা-সমিতিতে মহিলারা অবাধে যাতায়াত করছে।

কিন্তু এসব মওলবীরাই আবার ইসলামের নামে স্বদেশী নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে

রেখেছে। যদি তুমি নিজকে সময়ের সাথে পরিচালিত না কর, তাহলে অনেক পেছনে পড়ে যাবে।

আমি চাই তুমি সামাজিক হও। তুমি যতোটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু তোমার বাবার মর্যাদাই বাড়বে না, তোমার জীবনেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। মনের মতো সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তারাও তোমাকে বিয়ে করার জন্যে ঘুর ঘুর করবে।”

তার বাবা যে এতো বেশি প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এতে স্পষ্টভাবে আর কখনো ধরা পড়েনি নাহিদের কাছে।

নিজের কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েও নাহিদ খুবই স্বাভাবিক হয়ে বললোঃ "আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সে জীবনাদর্শই নারী জাতিকে ঐ মর্যাদা দিয়েছে যা আমেরিকা আর রাশিয়াও দিতে পারেনি।

ইসলামে মা, বোন ও কন্যার যে সম্মান রয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শে, ধর্মে বা মতবাদে কি সে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের?

স্ত্রীকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে তার কি কোন তুলনা হয়?

আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলে ডাকতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা বেচে দিয়েছেন। এখন নিজের কন্যার মান-ইজ্জতও বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন।

আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য করুক? তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক? এসব তো আমি কোন মুসলমানের সামনেও করতে রাজী নই। আপনি এখন আর আমার পিতা হওয়ার যোগ্য নন। আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা দেশের স্বাধীনতা ও আপন কন্যা

সন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।”

জওয়াব শুনে ফরিদ খান খুবই চিন্তিত হলো। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, বললো।

ঃ তোমার ধর্ম তোমাকে কি এ শিক্ষা দিয়েছে যে, নিজের পিতার সাথে এমন | বেআদবীসূচক কথাবার্তা বলবে। যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই ভেবে থাকে।

হাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলাম-বিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে পড়ে।

নাচতে যাওয়ার জন্যে ফরিদ খান নাহিদকে অনেকভাবেই রাজী করতে চেষ্টা করলো। প্রথম আদর করে, বুঝিয়ে, অবশেষে ধমকের স্বরেও তাকে রাজী করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একমতো জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের সাথে রেখে বাইরে চলে যায়।

রুশরা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। নাহিদ কিছুতেই নাচবে না ।

সে সামরিক ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান। আল্লাহর রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি নাচে শরীক হবে না।

জনৈক রুশ সেনা অফিসার বললো: ইসলাম তো আফগানিস্তান থেকে অনেক আগেই বিদায় দিয়েছে। আর এ ক্লাবের জলসা ঘরে তোমার আল্লাহও আসবেন । নরম কথায় যদি তুমি রাজী না হও, তবে অন্য রাস্তাও আমাদের জানা আছে।

নাহিদঃ তুমিও হয়তো ভুলে যাচ্ছে যে, আমি এক পাহাড়ী মেয়ে। সব ধরনের | নিপীড়ন সওয়ার মতো মনোবল ও ধৈর্য আমার রয়েছে।

আফিসারঃ তোমারও মনে হয় জানা নেই যে, রুশীয়দের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে, যা বিশালকায় পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

নাহিদঃ আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। | তাঁর এক দুর্বল বাদীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এততাই ইচ্ছে হয়ে থাকে,

তবে ইনশাআল্লাহ, আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও কঠোর দেখতে পাবে।

রুশ সেনা অফিসার নিরাশ হয়ে নির্যাতনের পথই বেছে নিলো। নাহিদের গায়ের কাপড়-চোপড় ছিড়ে তার শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের সাকা দিতে লাগলো সৈন্যরা।

ছুরির খোঁচায় তাঁর শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে

লাগলো সে পাষণ্ড অফিসার।

সবকিছু চরম ধৈর্যের সাথে মুখ বুজে সয়ে গেলো নাহিদ। সে এমন এক পর্বত বনে গেলো, যার সাথে টক্কর দিলে যে কেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

সারা রাতভর পাশবিক নির্যাতনে শেষ রাতের দিকে নাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। কিন্তু রুশ সৈন্যরা তাকে নাচাতে পারেনি।

মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুটো শ্লোগান তুলেছিলো।

'আল্লাহু আকবর’ ও ‘আফগানিস্তান জিন্দাবাদ।'

এই ছিল নাহিদের শেষ কথা। | শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে। ফেলে রাখে। ফজরের সময় আগত মুসল্লীরা লাশটি দেখতে পেলে গোটা এলাকা জুড়ে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে।

পরদিন স্কুলের ছাত্রীরা যখন নাহিদের শাহাদতের সংবাদ পেলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেই মসজিদের চত্বরে সমবেত হয়।

নাহিদের লাশ ছুঁয়ে তারা জিহাদের শপথ নেয় এবং তার রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে এজন ছাত্রী লিখে দেয় ‘আযাদী।'

এরপর যখন রাবেয়া বলখী স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের লাশ নিয়ে মিছিল করতে | থাকে; শুরু হয় গোলাবর্ষণ। একে একে ২৩

জন মুসলিম ছাত্রী শাহাদতবরণ করে। আহত হয় অনেকে।

এ ঘটনার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে কিন্তু আফগান মুসলিম জনসাধারণ তথা আযাদীর সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের হৃদয়ে নাহিদ ও তার বান্ধবীদের স্মৃতি আজো অম্লান হয়ে আছে।

মসজিদের প্রাচীরে এখনো রয়ে গেছে নাহিদের রক্তে লেখা আযাদীর পয়গাম। | যতোদিন পর্যন্ত আফগান মাটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হয়েছে, নিশ্চিহ্ন না হয়েছে সর্বশেষ গাদ্দার কমিউনিস্ট টি ততোদিন পর্যন্তই নাহিদ ও তার বান্ধবীরা অনুপ্রেরণা হয়ে আছে স্বাধীনতার সৈনিকদের, বিশ্ব জুড়ে ইসলামের কন্যাদের

জীবনে নাহিদ একটি চিরভাস্বর মহিমময় আদর্শ হয়ে অনন্তকালব্যাপী পথের দিশা দেবে। স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে থাকবে আলোর মশাল হয়ে।

মিসরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম তার "আয়াতুর রাহমান ফী জিহাদিল আফগান" (আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন) নামক বইয়ে লিখেনঃ

"আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত

কারামতসমূহ আমি নিজ কানে শুনে নিজের হাতে লিখেছি। এসমস্ত কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন।”

ডঃ আযমের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই থেকে নেয়া বেশ কিছু ঘটনা আমি প্রিয় পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

ডঃ আযযামের মুখেই শুনুন-

০৫) জিহাদ ও শহীদদের বিস্ময়কর কয়েকটি ঘটনা।

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কমান্ডার উমর হানীফ ইসলামী বিপ্লবী মোর্চার নেতা মাওলানা নসরুল্লাহ মনসুরের বাড়ীতে বসে আমাকে বলেছেনঃ

এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে। কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি। যদিও কুকুরেরা কমিউনিস্টদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরানো বারোটি কবর আমি নিজে খুঁড়েছি, কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি। একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে।

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেনঃ শহীদ আবদুল মজীদ

মুহাম্মাদের লাশ তিন মাস পরে আমরা দেখতে পাই। লাশ যেমন ছিল তেমনই, আর মিশকে আম্বরের খোশবু রয়েছে তাতে।

আবদুল মজীদ হাজী আমাকে বলেছেনঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ সাত মাস পরে আমরা পাই। মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন।

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ শহীদ নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি।

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেনঃ তিন-চার মাস পর আমি চার জন শহীদের লাশ পেয়েছি। এদের তিন জনের তো চুল-দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে। অন্য একজনের চেহারার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত।

আমার ভাই আবদুস সালামের লাশ দু'সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন ছিলো তেমনই আছে।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ আমাদের সাথী, একজন তালেব এলেম মুজাহিদ, আবদুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফতহুল্লাহ্ অন্ধকারের ভেতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই।

ফতহুল্লাহ্ বলে ওঠেঃ শহীদ খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র

খোশবু পেয়েছি। এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ পেলাম। ঘ্রাণ অনুসরণ করে আমরা যখন শহীদ আবদুস সামাদের কাছে পৌছলাম,

দেখি তার শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকচক করে জ্বলছে। আলো হয়ে জ্বলছে শহীদী লহু।।

(০৬) মুজাহিদের মিনতি ।

মশহুর মুজাহিদ আরসালান খান রহমানী-যিনি সোভিয়েত সৈন্য শিবিরে মানুষ খেকো' হিসেবে পরিচিত, তিনি আমাকে বলেনঃ

আমাদের হাতে একটি মাত্র রকেট লাঞ্চার আর একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গোলা। অন্যদিকে শত্রুদের রয়েছে দুই শত ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী।

আমরা আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বললাম, আয় আল্লাহ! একটি মাত্র অস্ত্রই যেন সঠিকভাবে গিয়ে লাগে। মিস্ যেন না হয়।

দোআর পর রকেট নিক্ষেপ করা হলে তা শত্রুদের বিস্ফোরক দ্রব্যের ট্রাকে গিয়ে পড়লো-আগুন আর বিস্ফোরণে ধ্বংস হলো পঁচাশিটি ট্যাংক ও গাড়ী।

দুশমন পরাজিত হলো। আমরা বিপুল গনীমতের মাল হাত

করলাম। রকেট নিক্ষেপকারী যুবক (বাতুর) কে পরে আমি নিজেই দেখেছি।

(০৭) চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ

শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশ জন মুজাহিদ ছিলাম।

দুই হাজার রুশ সৈন্য আমাদের উপর চড়াও হলে চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে। এতে ৭০/৮০ জন কমিউনিস্ট নিহত হয় আর বন্দী হয় ২৬ জন।

আমরা বন্দীদের জিজ্ঞেস করলাম যে, কেন তোমরা হেরে গেলে?

তারা বললোঃ চারদিক থেকে অসংখ্য কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা আমাদের কাবু করে ফেলে।

মাওলানা আরসালান বলেনঃ আমাদের কাছে কামান-মেশিনগান কিছুই ছিল না। দেশী কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা পঁচিশ জন একদিক থেকে গুলি ছুঁড়ছিলাম।

তিনি আরও বলেনঃ প্রায় এক শ’ বিশটি ট্যাংক ও বিপুলসংখ্যক সাঁজোয়া গাড়ী আমাদের উপর আক্রমণ করে।

এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে। অস্ত্র শেষ হয়ে আসছে।

বন্দিত্বের ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত প্রায়।

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম আমরা। একটু পরে চারদিক থেকে শুরু হলো গোলাবৃষ্টি-রকেট আর বুলেটের ছোটাছুটি।

কমিউনিস্টরা পরাজিত হলো। চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। মাওলানা আরসালানের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফেরেশতাদের কাজ।

(০৮) ফেরেশতাদের গায়েবী ঘোড়া।

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেনঃ উরগুন-৩২ নামক স্থানে আমরা কমিউনিস্টদের উপর হামলা করলাম। পাঁচশ'কে হত্যা এবং তিরাশি জনকে বন্দী করা হলো।

বন্দীদের উদ্দেশে আমি বললামঃ তোমরা কেন পরাজিত হলে? -আর আমাদের একজন মুজাহিদকে তোমরা শহীদ করেছ মাত্র।

বন্দীরা বললোঃ তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছ। গুলি ছুঁড়লেও ঘোড়ার গায়ে লাগতো না।

আমি বললামঃ এগুলো বদরের ফেরেশতা। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেনঃ "বালা ইন তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু......বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি

মুসাওইমীন" (১২৫-আলে ইমরান)

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কুরতুবী বলেনঃ যে সৈন্যরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আগমন করবেন এবং সহযোদ্ধা হবেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা (বদরে অবতীর্ণ পাঁচ হাজার) ফেরেশতাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যেই মুজাহিদ বানিয়েছেন।

হযরত হাসান বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেশতা মুসলমানদের জন্যে প্রতিরক্ষাস্বরূপ। (১৯৪-৪)

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেছেনঃ কমিউনিস্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা "ইখওয়ান আল-মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো।

লোকেরা তখন অবাক হতো। কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি।

এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিস্টরা ফেরেশতাদের কথাই বলছে।

(০৯) বুলেটের শেষ নেই

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী বলেনঃ মুজাহিদদের আমি কয়েকটি বুলেট | দিলাম ।

যুদ্ধে গিয়ে তারা অসংখ্য বুলেট ছুঁড়লো। শেষে তারা এসব ফিরিয়েও আনলো। বুলেট কমেনি।

(১০) ট্যাংকের তলায় অক্ষত মুজাহিদ

আবদুল জব্বার নিয়াজী আমায় বলেছেনঃ আমি দেখলাম, একটি ট্যাংক গোলাম মুহিউদ্দীন নামক মুজাহিদের উপর দিয়ে চলে গেলো; আর সে জীবিত রয়েছে।

লৌগর অঞ্চলের নায়েবে আমীর আরহাজম মুহাম্মদ ইউসুফ আমাকে বলেছেনঃ মুজাহিদ বদর মুহাম্মদ গুলের উপর দিয়ে একটি ট্যাংক চলে গেলে সে মরেওনি বা আহতও হয়নি।

(১১) বিচ্ছুও ছাড়েনি ওদের

“আপনার প্রভুর সৈন্য তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।” (আল-কুরআন)

আবদুস সামাদ ও মাহবুবুল্লাহ আমাকে বলেছেঃ কন্দুজ শহরের সমতল ভূমিতে কমিউনিস্ট সেনারা ক্যাম্প করলে বিষাক্ত বিচ্ছু এসে তাদের দংশন করে, এতে ছয় জন নিহত হয় এবং বাকীরা পালিয়ে যায়।

(১২) আব্বাকে তোরা মেরেছিস শয়তান!

আবদুল মান্নান আমাকে বলেনঃ মুজাহিদ আমীর জান শহীদ হয়েছেন। বহুদিন পর এই গ্রামে কমিউনিস্টদের ট্যাংক বহর এলে তাঁর তিন বছরের শিশু সন্তান ম্যাচের কাঠি হাতে দুশমনের ট্যাংক জ্বালাতে এলো

সোভিয়েত সেনা অফিসার জিজ্ঞেস করলেন যে, সে কি চায় । তখন অন্যরা উত্তর দিলো, ছেলেটি ট্যাংক পোড়াতে ও তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

(১৩) মুজাহিদদের বিছানায় সুশান্ত সাপ!

উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে। দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি।

আফগান পাহাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিয়েত কমিউনিস্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করে না, বরং পাহারা দেয়। এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলছে সাপ ও কমিউনিস্টদের লড়াই।

বিষধর পাহাড়ী সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতই না আত্মীয়, পুরানো বন্ধু।

(১৪) ষোড়শীর মেহেদীরাঙ্গা হাত।

মুহাম্মদ ইয়াসির আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদদেরকে মসজিদের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখলো বিশাল এক ট্যাংক ডিভিশন।

অবরোধের তৃতীয় দিবসে একটি ষোড়শী তরুণী বাইরে বেরিয়ে আল্লাহর কাছে মিনতি করলোঃ ইয়া রব, মুজাহিদদের কোন ক্ষতি না করে আমাকে তুমি তাদের বদলে কবুল কর। আমার উপর দিয়ে তাদের বিপদ কাটিয়ে দাও।

দুই দিন পর তার বিয়ের কথা ছিল। হাতে তার মেহেদীর রং।

বীরাঙ্গনা তরুণীটি শাহাদতবরণ করলো আর বেঁচে গেলেন মুজাহিদরা।

(১৫) ঘুমন্ত বোমা

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমরা ত্রিশ জন মুজাহিদের উপর বোমারু বিমান হামলা চালায়।

বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে।

একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি।

প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম।

আমাকে আবদুল মান্নান বলেছেনঃ আমরা তিন হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম। সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি। পরে আমরা এই তিনশ' বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি।

(১৬) খোশ-নসীব শহীদের গর্বিত মা

ভাই মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেনঃ আমাদের এক সাথী শাহাদতবরণ করলো।নাম তার আজীর গুল।

খবর পেয়ে শহীদের মা সুন্দর কাপড়-চোপড় পরে হাসি-খুশী চলাফেরা করতে লাগলেন। আর পাড়ার অন্যান্য লোক তাদের পড়শীর শাহাদতে বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করলো।

পুত্র শহীদ হলে আফগান মায়েরা খুশীই হন। কারণ, এর চেয়ে বড় কোন সম্মান তাঁদের দৃষ্টিতে নেই।

(১৭) বুলেট প্রুফ শরীর

মাওলানা জালালুদ্দীন আমায় বলেছেনঃ আমার সাথীদের মাঝে অনেক যুদ্ধফেরত মুজাহিদকে দেখেছি, যাদের জামা-কাপড় বুলেটের আঘাতে ছিড়ে গেছে, কিন্তু তাদের গায়ে একটি

বুলেটও ঢোকেনি।

শায়খ আহমদ শরীফ বলেছেনঃ আমার ছেলে যুদ্ধ হতে ফিরে এলো। তার পোশাক ছেড়া, অথচ গায়ে তার কোন আঘাত নেই।

নাসরুল্লাহ মনসুরের সচিব আমাকে বলেছেনঃ আজ ১.৪.৮২ একজন মুজাহিদ এসে পৌঁছেছে যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরটি গুলি লেগেছে, অথচ সে।

জীবিত রয়েছে।

মওলবী পীর মুহাম্মদ আমাকে বলেছেনঃ আমরা ১০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া অঞ্চলে ছিলাম। ১৮০টি বিমানের এক বহর সমতল ভূমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে।

আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম তখন আমাদের গায়ের জামা কাপড় তেনা তেনা হয়ে গেছে। আশ্চর্য! আমরা কেউ আহত হইনি।

কমিউনিস্ট মেরেছি ১৬০ জন। আর বিমান নামিয়েছি তিনটি। আমাদের দুই জন শাহাদত লাভ করেছেন।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর বুকে যে বুলেটের মালা থাকে, তার নিচে একটা গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি। এটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ আমি একটি বোমার উপর দিয়ে যেতে বোমাটি আমার পায়ের তলায় বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু আমি এতে মোটেও আহত হইনি।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেনঃ দুইবার আমার পায়ে রকেট পতিত হয়, কিন্তু আমি কোন কষ্টই পাইনি।

(১৮) শহীদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি

পশ্চিম কান্দাহারের হিলমুন্ড এলাকার নেতা মুজাহিদ আবদুল মান্নান আমাকে বলেছেনঃ

আমরা ছিলাম ৬০০ মুজাহিদ আর দুশমনরা ছিল ছয় হাজার। এরা সবাই রুশ সেনাবাহিনীর সদস্য,

এদের সাথে ছয়শ’ ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটি বিমান। ওরা হামলা করলে দীর্ঘ আঠারো দিন যুদ্ধ চললো।

ফলাফলঃ মুজাহিদ ৩৩ জন শহীদ হয়। দুশমনদের ক্ষয়-ক্ষতিঃ সোভিয়েত সৈন্য ৪৫০ জন নিহত। বন্দী ৩৬ জন। ৩০টি ট্যাংক আমরা চুরমার করে দেই এবং বিমান ভূপাতিত করি ২টি।

যুদ্ধের আঠারোটা দিন শহীদরা সব এমনিই পড়ে থাকে। মওসুম ছিল গরমের। কিন্তু একটি লাশও পরিবর্তন হয়নি, দুর্গন্ধও না।

শহীদানের মধ্যে আবদুল গফুর বিন দীন মুহাম্মদ একজন।

প্রতিরাতেই তার দেহ থেকে একটা আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতো এবং তা বেশ ক'মিনিট ধরেই থাকতো, যা সমস্ত মুজাহিদই দেখেছেন।

উমর হানীফ আমায় বলেছেনঃ

১৯৮২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতি রাতেই আকাশ হতে নূর এসে মুজাহিদদের বাসস্থানের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাপাদাপি করতো অতঃপর অদৃশ্য হয়ে যেতো।

(১৯) আগুন সেখানে অচল

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেছেনঃ

চার বছর ধরে (এখন দশ বছর) আমাদের উপর বিমান হামলা চলছে। এতে ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়,

জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায় সকল তাবু কিন্তু, রসদ ও অস্ত্রাগার কোনদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

(20) ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী আমাকে বলেনঃ

তারাকী আমলে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ট্যাংক বহর। আমাদের হাতে কোন P2P7 ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র

ছিল না।

তখন কিছু টাকা জমা করে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম একটা এন্টি-ট্যাংক হাতিয়ারের জন্যে।

কোন লাভ হলো না, বেহুদাই ঘোরা হলো।

আমরা ছিলাম ৩০ জন। একদিন তারাকীর বাহিনী আমাদের আক্রমণ করে বসলো। তাদের সাথে হাজার হাজার ট্যাংক, কামান, ভারী মেশিনগান।

আড়াই দিন যুদ্ধ চললো। কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী হারলো। আমরা গনীমতের মাল লাভ করলাম P2P7 ২৫টি ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র। আটটি ট্যাংক এবং একহাজার যুদ্ধবন্দী। এদের প্রত্যেকের সাথে একেকটা ক্লাসনিকোভ।

(২১) বিরাশির লড়াই

মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ আমরা ছিলাম ৫৯ জন মুজাহিদ। শত্রুরা আমাদের উপর চড়াও হলো। তাদের সাথে ২২০টি ট্যাংক-সামরিক ট্রাক। উপরে তো বোমারু বিমান বোমাবর্ষণে লেগেই আছে। মানুষও তারা পনেরশ'। ওদের সংখ্যা আমরা ওদের মাধ্যমেই জানতে পারলাম।

ফলাফলঃ ৪৫টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী বিধ্বস্ত। আহত-নিহত কমিউনিস্ট ২৫০ জন। বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ১০০।

ক্রেনকভ ক্ষেপণাস্ত্র ৩, ক্লাসনিকোভ ৭, সিক্সটি সিক্স মি মি কামান ও কামানের গোলা ২৮০, বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ ৩৬ হাজার।

(২২) সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াই।

আলহাজ মুহাম্মদ গুল আমাকে বলেছেনঃ

সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াইয়ে মুজাহিদ ছিলেন ১২০জন। দুশমনদের সংখ্যা ১০০০০ রুশীয় সৈন্য। তাদের ট্যাংক আট শত, বিমান পঁচিশটি।

ফলাফলঃ ৪৫০ জন রুশ নিহত এবং ১৩০ জন মিলিশিয়া নিহত, ১৫০টি ট্যাংক বিধ্বস্ত। ডিনামাইট ও রসদ বোঝাই এগারোটি গাড়ী দখল।

(২৩) এর একমাস পর

মুহাম্মদ গুল বলেনঃ

মুজাহিদ ৫০০, রুশ সৈন্য ট্যাংক ডিভিশনসহ দশ হাজারের উপর।

ফলাফলঃ আমরা ১২০০ দুশমন শেষ করেছি। দীর্ঘ একমাস এলাকাটি ছিল পূতিগন্ধময়।

(২৪) ফুলের তোড়া ও মিয়া গুল

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়াফের এক সহকারী মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেনঃ

আদীল মিয়া গুল ছিলেন বাগোন এলাকার চীফ কমান্ডার। তিনি রবিউল আওয়াল ১৪০৩ হিজরীতে শহীদ হন।

মিয়া গুল ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কৃতী সন্তান ও প্রখ্যাত নেতা। তার শাহাদাতে তার বংশের লোকজন সাংঘাতিক রকম আঘাত পেলো।

তাঁর নিজ বংশ 'আহমদ জাঙ্গ' গোত্রের লোকসংখ্যা একলক্ষ বলে শোনা যায়। মিয়া গুল ছিলেন তাঁদের ভাইদের মধ্যে চতুর্থ শহীদ।

মিয়া গুলের শাহাদাতে তাঁর পরিবারবর্গ খুবই চিন্তিত ও শোকাহত হয়ে পড়ে এবং তার জন্যে কান্নাকাটি চলতেই থাকে।

তার ভাই রাতের বেলা ওযু করে আল্লাহর কাছে দোআ-কান্নাকাটি করে বললেনঃ আয় আল্লাহ্! আমার ভাই যদি শহীদী মওত পেয়ে থাকে তাহলে এর একটা চিহ্ন আমাদের দেখাও।

দোআর পর তিনি শেষ রাতে নামাযের জন্যে ওঠার নিয়তে শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ যেন কি একটা পতনের শব্দ হলো-তারা লাইট জ্বেলে দেখলেন, একটা পুষ্পস্তবক। অতুলনীয় এ

তোড়াটির গা শিশিরসিক্ত। অজ্ঞাতপূর্ব এক জান্নাতী খোশবু বের হচ্ছে তা থেকে। সারাটা ঘর সুরভিতে 'ম' 'ম' করছে।

পরিবারের সবাই জমা হলো এবং এই কারামতটি প্রত্যক্ষ করলো। সকালে মুহাম্মদ ইয়াসিরকে দেখাবে বলে কুরআন শরীফের কাছে তোড়াটিকে তারা রেখে দিলো, কিন্তু সকাল বেলা আর এটা পাওয়া গেলো না।

(২৫) রণাঙ্গনে প্রশান্তিময় তন্দ্রা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ "যখন আল্লাহর তরফ হতে তন্দ্রা এসে তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেললো।"-(আনফাল-১১)

মুখতাসার ইবনে কাসীর সাবুনীতে বর্ণিত হয়েছে (২-৯০), হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, ওহুদের দিনে তন্দ্রাচ্ছন্নদের মধ্যে আমিও ছিলাম। বারবার আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেছে। পড়ে আর তুলি। পড়ে যায় আর উঠাই ।

সবাইকে দেখলাম, তারা ঢালের নিচে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আরামরত।

হাফেয আবু ইয়ালা হযরত আলী (কঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ বদরের দিন 'মিকদাদ' ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন ঘোড়সওয়ার ছিল না।

আমাদের মাঝে কেউ জেগে নেই। শুধু হুযুর আকরাম (সাঃ) গাছের তলায় নামায পড়ছেন আর কাঁদছে-সকাল হওয়া পর্যন্তই এমনটি চলছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, লড়াইয়ের সময় প্রশান্তিময় তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হতে থাকে আর সালাতের ভেতর শয়তানের পক্ষ হতে।

(২৬) আরসালানের সুখনিদ্রা।

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন, তিনি শাহীকো যুদ্ধক্ষেত্রে সব ধরনের বোমা ও রকেট বৃষ্টির ভেতর দশ মিনিট সময় দ্রিাচ্ছন্ন ছিলেন।

দরবকী রণাঙ্গনের কথা আমাকে বলেছেন আবদুর রহমান।তিনি বলেনঃ

দেড়শ’ থেকে দুইশ’ ট্যাংক আমাদের উপর হামলা করে। অত্যধিক গোলা ও শেল বর্ষণে মুজাহিদরা ২/৩ দিন কিছুই শুনতে পায়নি। অতঃপর যুদ্ধ চলাকালীনই আমাদের উপর ঘুম নেমে এলো। যখন উঠলাম তখন সবাই নিশ্চিন্ত।

একজন মুজাহিদ ট্যাংকের উপর হামলা করলে সেটা জ্বলে গেল । জ্বলন্ত ট্যাংকের ভগ্নাবশেষ ছিটকে গিয়ে পড়লো অস্ত্র বোঝাই ট্রাকের উপর ।

গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ৭টি গাড়ী শেষ। আমরা ৫টি গাড়ী গনীমতের মাল হিসেবে পাই।

ইঞ্জিনিয়ার গুলবদন হিকমতইয়ারের দেহরক্ষী আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ যুদ্ধের মাঠে কয়েকবারই আমার উপর নিদ্রা নেমে আসে। আমি এটাকে আল্লাহর নেয়ামত এবং তাঁর তরফ হতে দেয়া প্রশান্তি বলে মনে করি। পাঘমানের আবদুর রশীদ আবদুল কাদির আমায় বলেছেনঃ সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণের সময় মুজাহিদদের উপর ঘুম নেমে আসতে আমি তিন তিনবার দেখেছি।

এসময় মুজাহিদরা ২/৩ মিনিট ঘুমে অচেতন থাকার পর নব-উদ্দীপনা নিয়ে দাঁড়ান এবং রুশ সৈন্যদের উপর বিজয়ী হন।

(২৭) মৃত্যুহীন প্রাণ

"নির্দিষ্ট সময়ের আগে এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন প্রাণীই মৃত্যুবরণ করতে পারে না।" (আলে-ইমরান)

“আল্লাহই উত্তম রক্ষক আর তিনি সেরা দয়াময়।”-(ইউসুফ-৬৪)

গজনী শালগড়ের মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে বলেছেনঃ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আখতার মুহাম্মদের উপর দিয়ে ট্যাংক চলে গেলো অথচ সে মরলো না।

যখন রুশরা দেখতে পেলো যে, সে মরেনি, তখন আবার তার

উপর দিয়ে ট্যাংক চালালো, তবু সে মরলো না।

এরপর তারা অন্য দুই জন মুজাহিদসহ আখতারকে ধরে নিয়ে সাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি করলো, এতে দু’জন শহীদ হলো এবং তিন জনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ওরা এসে এদেরকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো। এরপর রুশ কমিউনিস্টরা চলে যাওয়ার পর আখতার মুহাম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের কাছে ফিরে এলো। এখনো সে জীবিত এবং জিহাদত।

গজনীর মুজাহিদ নসরুল্লাহ হতে বর্ণনা করে মুহাম্মদ মঙ্গল আমাকে শুনিয়েছেন যে,

নসরুল্লাহর গায়ে দুটো বুলেট লেগে তাকে আহত না করে তার পকেটে ঢুকে পড়ে। তখন তিনি বুলেট দুটি মুজাহিদদের দেখালেন। মঙ্গলের এ বর্ণনার আরও বহু সাক্ষী রয়েছে।

মাওলানা আরসালান বলেছেনঃ

হযরত শাহ তার চোখে দোশকার গুলি খেলেন, তার কিছুই হলো না। একটু যা চোখটা লাল হয়েছে।

পাঘমানের কমান্ডার মুহাম্মদ নাঈম আমাকে বলেছেন,

একটি বিমান তাদের উপর ১৪টি গোলাবর্ষণ করে। এর মধ্যে ১৩টি গোলা পার্শ্ববর্তী একটি কবরের উপর বিস্ফোরিত হয়। মুজাহিদরা কেউ আহত হয়নি।

(২৮) তাঁবু পুড়ে ছাই, ভেতরে অক্ষত তিন মুজাহিদ

জালালুদ্দীনের ভাই ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ

১৯৮৩ সনের ৮ই মার্চ আমাদের উপর কামানের দুটি গোলাবর্ষণ করা হয়। আমাদের তাঁবুর নয়টি জায়গা পুড়ে গেলেও ভেতরে অবস্থানরত তিন জনের কারোই কোন ক্ষতি হয়নি।

আমার পোশাক ও আমার বিশ জন সাথীর মধ্যে অধিকাংশের জামা-কাপড় জ্বলে গেলো, কিন্তু একজনও আহত হলো না।

ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ ১৪০২ হিজরীর ২০শে শাবান খোস্ত পাকতিয়া | প্রদেশের বিজ্জীর লড়াইয়ে আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হলে আমার টেলিস্কোপ ভেঙ্গে গেলো, জ্বলে গেল আমার পায়জামা। আমি (আবদুল্লাহ আযযাম) ইব্রাহীমের পায়জামাটি স্বচক্ষে দেখেছি আর শেলোয়ারটি এখনো

আমার সংগ্রহে রয়েছে।

কেউ আহত হয়নি। উপস্থিত মুজাহিদদের অনেকের গায়েই গোলা পতিত হয়েছে। এতে অনেকের বুকে বাঁধা বুলেটের বেল্ট ছিড়ে গেছে, কাপড় পুড়েছে, কিন্তু একজনও তারা আহত হয়নি।

ইব্রাহীমের গাড়ী একটি ডিনামাইটের উপর দিয়ে চলে গেলেও সেটি বিস্ফোরিত হয়নি; অথচ অন্য একটি ট্যাংক যাওয়ার

সময় ডিনামাইটটি গর্জে ওঠে।

ইব্রাহীম আমাকে বলেছেনঃ তারা ৩০ জন মুজাহিদ রমা নামক স্থানে ছিলেন। শত্রুরা ছিল তিন শত। সঙ্গে আছে ট্যাংক বুলডোজার-ট্রাক ইত্যাদির বিরাট এক বহর। দুশমন পরাজিত হলো। আমরা গনীমত লাভ করলাম দুটি কামান, একটি গাড়ী, তিনশ’ গোলা ও মাইন, বুলেট ত্রিশ হাজার, ছয়টি ক্লাসনিকোভ গান।

যুদ্ধলব্ধ মাল ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার বোঝাই করলাম গাড়ীতে। মুহাম্মদ রাসূল গাড়ীটি ড্রাইভ করছিল আর আমি তার পাশের সীটে। গাড়ী একটি ডিনামাইটের উপর দিয়ে চলে গেলো সেটা বিস্ফোরিত হলো না। অথচ এ ডিনামাইটটির উপর দিয়েই একটা রুশ ট্যাংক যাওয়ার সময় সেটি গর্জে ওঠলো।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, কামানের ভেতর R. P. গোলা বুলেটের আঘাতে | ছিদ্র হয়ে গেছে, কিন্তু কামান বহনকারী মুজাহিদটির কিছুই হয়নি।

জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের ভাই খলীলের টেলিস্কোপের কাচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, কিন্তু খলীল অক্ষত-নিরাপদ। ভাঙ্গা টেলিস্কোপটি আমিও দেখেছি।

ফহুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ যরগন শাহ্ মুজাহিদের পকেটে গুলি লেগে কাপড় ও ডাইরী জ্বলে গেছে, ভেঙ্গে গেছে পকেটে রাখা আয়না, কিন্তু যরগন শাহ্ কোন আঘাত পায়নি।

তিনি আরও বলেছেনঃ বিমানের গোলাবর্ষণে তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরের মুজাহিদদের কারোই কিছু হয়নি।

আকলুদ্দীনের দুই পায়ের মাঝে গোলা বিস্ফোরিত হয়, তার সাথে ছিল আবদুর রহমান। তারা একজনও আহত হয়নি।

কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে এ কাহিনীটি শুনিয়েছেনঃ

মুজাহিদদের ট্যাংকের নিচে পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হলে তাদের মাথার পাগড়ী উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

বারী' কিল্লা জয় করার উদ্দেশে ফহুল্লাহ ও ইব্রাহীম ট্যাংক নিয়ে এগিয়ে চললেন। নিচে মাইন বিস্ফোরিত হলে তাঁদের মাথার পাগড়ী উড়ে গেলো। অথচ তারা কেউ আহত হলেন না।।

আবদুল করীম আমায় বলেছেনঃ মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল আলীকে দেখলাম, বুলেটের বৃষ্টিতে তার জামা-কাপড় জ্বলে গেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি।

মওলবী ইয়োরদোল আমাকে বলেছেনঃ আমি দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রামে যাচ্ছি। আটটি বিমান আমার উপর হামলা চালিয়ে যেতে লাগলো। বিমানের পাইলট ও অন্যদের আমি দেখতে পাচ্ছিলাম; আর আমার হাতে ছিল আমার হাতিয়ার।

(২৯) শহীদী শোণিতের সুরভি

মুজাহিদদের কাছে শহীদের রক্তের খোশবু বড়ই পরিচিত। বহুদূর হতেই তারা এর সুঘ্রাণ পেয়ে থাকেন।

মাওলানা আরসালান খান আমাকে বলেছেনঃ

শহীদ আবদুল বছরের শাহাদাতের স্থানটি আমি অন্ধকার রাতে রক্তের সুগন্ধিতেই চিনেছিলাম।

আমাকে ইব্রাহীম জালালুদ্দীন বলেছেনঃ তখন গাড়ীতে চলছিলাম। আমি একটা সুবাস পেলাম।

তখন আমার সঙ্গীকে বললামঃ এটা শহীদের খোশবু। কারণ, শহীদের রক্তে একটা বিশেষ পবিত্র সুরভি রয়েছে, যা আমাদের অতি চেনা। আর নয়তো, কোন অঞ্চলে শহীদ থাকলেও আমাদের জানার উপায় ছিল না যে, এখানে ঘুমিয়ে আছে কোন শহীদ।

খেয়াল মুহাম্মদ গন্ধ শুকে বলতে পারেন কোনটা শাহাদাতের জায়গা।

আমি একটা সুগন্ধ শুকলাম। সঙ্গীকে বললাম, আকলুদ্দীন মনে হয় এখানেই শহীদ হয়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, এখানেই তাঁর শাহাদাত নসীব হয়।

(৩০) এক শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছিল তিন মাসেরও বেশি

নাসরুল্লাহ মনসুর আমাকে বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেনঃ আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্নে দেখলেন।

আমার ভাই মাকে বললোঃ আম্মা, আমার সব জখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো হয়নি।

স্বপ্ন দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুলে দেখবেন তিনি। ভাইয়ের কবর খুঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছে অন্য আরেকটি কবর উদোম হয়ে গেলে আমরা দেখতে পেলাম কবরটির ভেতরে মৃতের উপর একটি অজগর। দেখে মা বললেনঃ নিঃসন্দেহে আমার ভাই শহীদ। তাঁর কবরে সাপ থাকতেই পারে না।

অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা এলো। নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম।

ভাইয়ের মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম। আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি ছুঁয়ে দেখলেন, তাঁর আঙ্গুলটি সুবাসিত হয়ে যায়।

দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে খোশবু রয়ে গেছে। আঙ্গুলটি

এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর।

মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেনঃ আমাদের সঙ্গী চার জন মুজাহিদ শহীদ হয়। তাদের শরীর হতে ছড়ানো মিশকের মতো সুবাস আমরা চার মাস পরও পেয়েছি।

(৩১) মরেও তারা অস্ত্র ছাড়েনি।

লৌগরের শহীদ মীর আগা রিভলবার ছাড়তে চায়নি।

যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের এক সঙ্গী মীর আগা শাহাদাতবরণ করে। তার হাতে ছিল একটি রিভলবার।

যখন মুজাহিদরা বিভলবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলেন, তখন মীর আগা সেটি ছাড়েনি। পরে আমরা তার বাড়ীতে গিয়ে খবর দিলাম।

তার পিতা (কাজী মীর সুলতান এসে বললেনঃ বাবা, এ রিভলবার তো তোমার নয়, এটি মুজাহিদীনের। তৎক্ষণাৎ সে রিভলবারটি রেখে দিলো। | |

লৌগরের শহীদ সুলতান মুহাম্মদ ক্লাসনিকোভ গান দিতে চায়নি।

যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের সাথী সুলতান মুহাম্মদ

১৯৮৩ সালের মার্চে শহীদ হয়।

শাহাদাতের পর সে তার ক্লাসনিকোভটি কোলে চেপে রাখে। রুশ সৈন্যরা এসে অস্ত্রটি হাত করার জন্যে চেষ্টা করলো, কিন্তু শহীদ দুশমনদের হাতে সেটি দিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত লাল সেনারা তার হাত কেটে ক্লাসনিকোভটা নিয়ে গেলো।

মুহাম্মদ শিরীন আমাকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং গোলাম হযরত শাহাদাতের পরও অস্ত্র দিতে রাজী হয়নি।

(৩২) শহীদানের মুখে হাসি

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন যে, বিমানের গোলার আঘাতে শহীদ হলো নেক্কার তালেবে এলম আবদুল জলীল।

আসরের সময় জানাযার পর তাকে তার বাড়ীতে পাঠানো হলে মুজাহিদরা সকাল পর্যন্ত তার লাশের সাথে ছিলেন।

আবদুল জলীল চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে হাসছিলো। এমন অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আরসালানের কাছে এসে বললেনঃ আবদুল জলীল মারা যায়নি।

আরসালান বললেনঃ অবশ্যই সে শহীদ হয়ে গেছে।

মুজাহিদরা বললেনঃ তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে

দাফন করা জায়েয হবে না। প্রয়োজনে পুনরায় তার জানাযা পড়তে হবে।

আরসালান বললেনঃ সে গতকালই শহীদ হয়েছে। আর এটা তার কারামত।

(৩৩) হামীদুল্লাহ হাসছিলো

পাঘমানের জেনারেল কমান্ডার উমর আমাকে বলেছেনঃ

আমাদের সহযোদ্ধা হামীদুল্লাহ শহীদ হলে তাকে দাফন করার সময় দেখি সে হাসছে। মনে মনে ভাবলাম যে, আমি ভুল করছি না তো। লাশ বাইরে রেখে চোখ কচলে নিয়ে ভালোমতো লক্ষ্য করলাম। নাহ্! সে হাসছেই।

মাওলানা হাক্কানী বাহিনীর বড় নেতা ফাতহুল্লাহ আমাকে বলেছেনঃ

দাফনের চার দিন পর শহীদ ছোহবত খানকে আমি দেখলাম সে হাসছে। অতঃপর আমরা তার কবর খুঁড়লাম। খায়রুল্লাহ বলেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম, শহীদ আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো।

মৌলবী আবদুল করীম আমাকে বলেছেনঃ

প্রায় বারো-শ শহীদ আমি দেখেছি। এদের একজনের লাশেও কোন পরিবর্তন হয়নি বা কারো লাশকেই কুকুরেরা স্পর্শ করেনি,যদিও আফগানিস্তানের পাহাড়ী কুত্তাগুলি কমিউনিস্টদের লাশ খায়।

ফতহুল্লাহ বলেছেনঃ হাকীম খান নামক আমার নেতৃত্বাধীন একজন মুজাহিদ আমাকে বললোঃ

তমীজ খান নামের একজন মুজাহিদকে আমরা ৫৫ মাস পর কবর থেকে উঠালাম।

লাশে কোনরূপ পরিবর্তন নেই; আর প্রবহমান রক্ত সুবাস ছড়াচ্ছে।

জাদরান পাকতিয়ার জালালুদ্দীন আমাকে বলেছেনঃ

কোন শহীদকেই আমি কুকুরকে খেতে দেখিনি। গোলাপ নামের এক শহীদকে আমি দেখেছি। পঁচিশ দিন তার লাশ ময়দানে পড়ে ছিল। আশেপাশে বহু কমিউনিস্টের মরা লাশ কুকুরে খেলেও তারা শহীদের লাশে মুখ লাগায়নি।

(৩৪) শহীদ মায়ের বুকে দুধের মেয়ে

ইয়েরদিল ও তার সহকারী মুহাম্মদ করীম আমাকে বলেছেনঃ

মঙ্গল নামক ব্যক্তির স্ত্রী ও শিশু কন্যা শহীদ হলে লোকজন

এসে দুধের বাচ্চাটিকে মায়ের বুক থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো (শহীদ মা ও শহীদ শিশু কন্যা একই সাথে গলাগলি জড়ানো এবং মেয়েটির মুখে এখনো দুধের বোঁটা।)

হানাফী মাযহাবে প্রয়োজন ছাড়া একই কবরে দু'জনকে দাফন করা নিষেধ।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উলামারা ফতওয়া দিলেন, মা-মেয়েকে একই কবরে শোয়ানোর জন্যে।

(৩৫) আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের ফরিয়াদ || অস্ত্র ও রসদ শেষ-আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়।

ইয়োরদিল আমাকে বলেছেনঃ

চাতু ও ওরক অঞ্চলে সাত দিন ধরে কমিউনিস্টদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চললো।

সাত দিনের মাথায় আমাদের অস্ত্রপাতি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলে ঐ রাতেই তিন দিক থেকে দুশমনদের উপর শুরু হলো গোলাবৃষ্টি। আমরা জানি না কোথেকে আসছে এসব।

কাফেররা তো অবাক। কারণ, এমন জাতের বুলেট-গোলা-মর্টার-রকেট ও অন্যান্য অস্ত্র তারা এর আগে কোনদিন দেখেনি। সুতরাং বত্রিশ জন অফিসারসহ মোট পাঁচশ' কমিউনিস্ট মরলো। বাকীরা প্রাণ নিয়ে পালালো।

যে কয়জন মুসলমানকে বন্দী করে তারা নিয়ে গেলো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এসব মডেলের অস্ত্র তোমরা কোথেকে সংগ্রহ কর? আমরা (রাশানরা) কোনদিন এসব অস্ত্র দেখিনি।

(৩৬) পাথর ফেটে পানি

সাঈদুর রহমান (পাঘমান) আমায় বলেছেনঃ

ওয়াইগিল পাহাড়ে আমাদের খুব পিপাসা হলো। পিপাসা আমাদের কাতর করে ফেললো। পথ চলা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

পাহাড়ী রাখালদের কাছে পানির কথা বললে তারা বললোঃ এ পাহাড়ে পানি নেই।

আমরা ঠায় বসে পড়লাম। হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম।

কাছেই তখন একটি পাথর ফেটে পানি বইতে লাগলে আমরা সেদিন পঁয়তাল্লিশ জন মুজাহিদ প্রাণভরে পানি খেয়েছিলাম।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেবের জামাতা খেয়াল মুহাম্মদ আমায় বলেছেনঃ

আমরা ছিলাম ষাট জন। চল্লিশ জন এক জায়গায় আর বিশ

জন অন্যখানে। দুশমনরা ছিলো তেরশ'। সঙ্গে তাদের আশিটি ট্যাংক-বুলডোজার-সাঁজোয়া গাড়ীসহ সামরিক কনভয়।

আমি (খেয়াল মুহাম্মদ) উঠে দাঁড়িয়ে দো'আ করলাম আর পড়লাম, "ওয়ামা রামাইতা ই রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা।" এরপর এক মুঠ কংকর নিয়ে ছুটে আসা ট্যাংক বহরের দিকে ছুঁড়ে মারলাম।

সময়টা ছিল যোহরের পর। প্রচণ্ড গরমে দাঁড়িয়ে এই তদবীরটা করতে যেয়ে আমি কেঁদে ফেললাম।

প্রথম ট্যাংকটা যখন আমাদের অবস্থানের কাছাকাছি একটা ব্রীজে উঠছিলো, তখন মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো গর্জে উঠলে ট্যাংকটা নিচে গড়িয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় ট্যাংকের দিকে ছোট্ট একটি বোমা নিক্ষেপ করলো আরেকজন মুজাহিদ।

বোমাটি ফাটতেই কাফেররা মনে করলো যে, রাস্তায় মাইন পাতা রয়েছে, সেটাই বিস্ফোরিত হয়েছে।

এই কথা ভেবে যেইনা তারা ট্যাংক সাইডে নিয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার নরম পাড়ে ট্যাংকটি গেড়ে বসলো। পাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় নিরুপায় কাফের-কমিউনিস্টরা অস্ত্র জমা দিয়ে একে একে আত্মসমর্পণ করলো।

সেদিন আমরা যা পেয়েছিলামঃ

১.দোশকা।

২. হাউন কামান।

৩. মধ্যম হাউন ১৯টি।

৪. RPJ ১২টি।

৫. ক্লাসনিকোভ (২৬০০) ছাব্বিশ শ’।

৬. ৮২ মি. মি. কামান ৭টি।

৭. দোশকার বুলেট ২৬,০০০টি।

৮. সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যান ২৫টি।

বিপুল সংখ্যক হাতিয়ার ও যানবাহন আমরা আগেই ধ্বংস করে দেই।

বাতুর যুদ্ধের কমান্ডার আবদুর রহমান আমাকে বলেছেনঃ

৮০০ হতে ১২০০ জনের একটি কোম্পানী সঙ্গে তাদের ৫৮টি ট্যাংক ও গাড়ী।

আমরা ৩০ জন মুজাহিদ,

৩ দিন লড়াই চললো। তৃতীয় দিন আমাদের কাছে ব্রেনগানের ৫টি মাত্র গুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যোহরের নামাযের সময় আমরা পরস্পরে বলাবলি করলাম যে, দুশমনকে রোখার

মতো শক্তি আর আমাদের নেই

নামাযের পর হাত তুলে দোআ করলাম। দোআর পর উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ফায়ার করলাম গাড়ী লক্ষ্য করে। আগুন ধরে গেলো গাড়ীগুলোতে। শত্রুরা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে নেমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

যুদ্ধলব্ধ গনিমতঃ

১. অক্ষত ট্যাংক ৫টি।

২. বড় আকারের কামান।

৩. অক্ষত গাড়ী ৩০টি।

৪. ১৬টি উর্ধ্বে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট (৯ কি. মি.)।

৫. বিপুলসংখ্যক ক্লাসনিকোভ।

(৩৭) প্রস্তরময় শুকনো যমীন হতে পানি প্রবাহ

পাকিস্তানের এক পাহাড়ী অঞ্চলে কিছুসংখ্যক আফগান বসবাস করতে থাকলে শুকনো স্থানটিতে পানিপ্রবাহ শুরু হলো এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রস্তরময় জায়গাটি হয়ে উঠলো শ্যামল-সজীব।

সুজলা-সুফলা মাটি দেখে পাকিস্তানীদের মনে লোভ হলো।

তারা আফগানীদের বের করে দেয়ার পরই আবার যেই-সেই।

সুফলা সবুজ এলাকা আবার। প্রাণ-রসহীন, ধূসর হয়ে গেলো।

(৩৮) মেঘমালার ছায়া

মাওলানা হাক্কানী বলেনঃ তারাকী আমলে আমরা পাহাড়ে রান্নাবান্না করতে আগুন জ্বালাতে পারতাম না।

যেখানে আমাদের ঘাঁটি ছিল, এর আশেপাশে বহু গুপ্তচর থাকতো। সরকারী টিকটিকির ভয়ে আমরা চিন্তিত।

আল্লাহপাক মেঘের ছাদ বানিয়ে দিলেন আমাদের মাথার উপর। মেঘমালার ছায়ায় আর ধোয়ার চিহ্নও দেখতে পেতো না কমিউনিস্টদের গোয়েন্দারা।

(৩৯)খোদায়ী রাডার

একথা সর্বজনবিদিত ও সুপ্রমাণিত যে, মুজাহিদদের উপর বিমান হামলার আগে পাখির ঝাঁক চলে আসে।

মুজাহিদরা পাখি দেখেই বুঝেন যে, রুশ বিমান আসছে।

বিমান যখন বোমাবর্ষণ করতে থাকে, তখন বিমানের নিচে ডানা মেলে দিয়ে বোমা প্রতিহত করে পাখির দল। জঙ্গী বিমানের চেয়ে দ্রুত এদের গতি। (জঙ্গী বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণও হয়ে থাকে।)

মুজাহিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, পাখিরা সাথে থাকলে বিমান হামলার ক্ষয়ক্ষতি কম হয়; আর কখনো মোটেও হয় না।

পাখির ঝাঁক যারা দেখেছেন তাদের কয়েকজন-

মুহাম্মদ করীমঃ আমি তাদের বিশবারের চেয়ে বেশি দেখেছি।

মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীঃ বহুবার আমি পাখিদের দেখেছি।

মাওলানা আরসালান খান রহমানীঃ অসংখ্যবার আমি এদের প্রত্যক্ষ করেছি।

যারা সবচেয়ে বেশি স্থানে পাখির ঝাঁক দেখতে পেয়েছেনঃ

মুহাম্মদ শিরীন, মওলবী আবদুল হামীদ, এলেম গুল, ফজল মুহাম্মদ, জান মুহাম্মা, খিয়ার মুহাম্মদ, উজীর বাদশা, সৈয়দ আহমদ শাহ, আলী ও জান।

পূর্বোক্ত কারামত ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ যুদ্ধের প্রাথমিক দিক দিয়ে সংঘটিত বিপুলসংখ্যক ঘটনাবলীর একাংশ যা একজন মিসরীয় বুদ্ধিজীবী, লেখক ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম নিজে আফগান জিহাদের কতিপয় মুজাহিদের কাছে শুনেছেন এবং প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার নায়কের মুখে শুনে তার বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছরের এ মহান জিহাদে আল্লাহর সৈনিকরা যেসব খোদায়ী সাহায্য ও

আসমানী বিজয়ের ঘটনা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করেছেন তার হাজার ভাগও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ লক্ষ শহীদান ও গাজীদের। ঘটনা কি বইপত্রে লিখে রাখা সম্ভব?

তবে আফগানিস্তানের খুনরাঙ্গা মাটির প্রতিটি ইঞ্চিতে দেখা গেছে আল্লাহর নুসরত যা সারা বিশ্ব-বিবেককে নাড়া দিয়েছে। কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছে সকল তাগুতী শক্তির।

রুশ-মার্কিন আগ্রাসী পরাশক্তিদ্বয়ের পিলে চমকে দিয়েছে, যাতে হৃৎকম্প শুরু হয়েছে ইহুদী-ইসরাঈল ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের।।

অপরদিকে এসব জিন্দা কারামত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রাণে জাগিয়েছে নতুন চেতনার অগ্নিমশাল-আশার সহস্র প্রদীপ। ইসলামী দুনিয়া জুড়ে জন্ম দিয়েছে জিহাদী ঐতিহ্যের নতুন জাগরণ।

গোটা আলমে ইসলামী জুড়ে উঠেছে এক আওয়াজ-

আফগান, আফগান!

মুজাহিদীনে আফগান!!

- লেখক উবায়দুর রহমান খান নদভী

আজ মুসলিম উম্মাহের বিজয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা পরাজিত মন মানসিকতা

আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়ের ওয়াদা করেছেন এবং তিনি যুগে যুগে তার মুসলিমদেরকে অতি সামান্য অস্ত্রের মাধ্যমেই অলৌকিক ভাবে বড় বড় পরাশক্তির উপর বিজয় দান করেছেন। এ মহা সত্য যেন আমরা ভুলতে বসেছি তাই আজ আমাদের এই পরাজিত মন মানসিকতা।

তবে আফগান জিহাদে বড় বড় দুই পরাশক্তির উপর আল্লাহ তার সৈনিকদেরকে অলৌকিক ভাবে বিজয় দান করলেন।

এটা ঘটনা যেন আমাদেরকে চিৎকার করে বলছে :

হে মুসলিম রা!

তোমরা কেন আল্লাহর ওয়াদা ভুলে গেলে?

চোখ মেলে দেখো

বদর, উহুদ, খন্দকের সেই খোদা-ই নুসরত এখনো জারি আছে।

আল্লাহর ওয়াদা সত্য

সুতরাং আর দেরি করো না

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে আর নির্যাতিত উম্মাহকে রক্ষা করতে চলে এসো ময়দানে।

ময়দানে আল্লাহর নুসরাতের এসব অলৌকিক ঘটনা গুলো আমাদের এই পরাজিত মন মানসিকতা দূর করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাল্লাহ। এই ঘটনাগুলো কপি করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করুন।

নিচের সাইটে ঘটনাগুলোর টেক্সট আকারে পাবেন সেখান থেকে কপি করতে পারবেন।

https://justpaste.it/9cfim

এখানে শুধু বইটিতে উল্লিখিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের সময়কার অলৌকিক ঘটনা গুলো আনা হয়েছে।

মূল বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেক কিছু রয়েছে।

আফগানে বাংলাদেশি ওলামায়ে কেরাম সফর করেছিলেন। তারা একটি সফরনামাও লিখেছেন যাতে রয়েছে জানার ও বোঝার অনেক কিছু।

ওই সফরনামার মূল মূল পয়েন্ট গুলো লেখক খুবই সুন্দর করে বইটিতে উপস্থাপন করেছেন।

সুতরাং দেরি না করে মূল বইটি পড়ে নিন। উপরোল্লেখিত সাইটে বইটি ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবেন।